BANGLADESH JOURNAL OF ISLAMIC THOUGHT, 12(17 & 18), 2016: 127-140
Copyright © BIIT
ISSN 1816-689X

ফর্‌রুখ আহমদ-এর 'মৃত-বসুধা' ও সেলিনা হোসেন-এর 'বৈশাখী গান': নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও বাস্তবতা

মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন *

সার সংক্ষেপ: কারো কারো মতে আদিকাল তথা পৃথিবী সৃষ্টির ঊষালগ্ন থেকেই নারীরা লাঞ্ছিত এবং পদে পদে বঞ্চনা-প্রতারণার শিকার। তবে ইসলামের প্রকৃত ইতিহাস তা কখনো বলেনি, বরং মধ্য যুগে কন্যা শিশুরা জন্ম থেকেই লাঞ্ছিত হতো। হযরত মুহাম্মদ সা.-এর মাধ্যমে ইসলাম ধর্মকে পরিপূর্ণ করে দেবার পর ইসলামি রাষ্ট্রসমূহে নারীরা অধিকার ভোগ করতে থাকে। যে সকল রাষ্ট্র ইসলামি হুকুমত কায়েম করতে পারেনি বা ইচ্ছা করে ইসলামকে দূরে ঠেলে রেখেছিল, তাদের ক্রমাগত ষড়যন্ত্রে এক সময় পৃথিবী জুড়ে নারীরা বঞ্চিত হতে থাকে, যা আজো বিদ্যমান। যদিও শিল্প বিপ্লবের মধ্য দিয়ে নারীদের কর্ম যোগ্যতার অর্থনৈতিক মূল্যায়ন শুরু হয়েছে, মানবতার মাপ কাঠিতে নারীদেরকে অধিকারের আড়ালে অবক্ষয়ের দিকে যেমন ঠেলে দিয়েছে, তেমনি নগ্নতাবাদকে কায়েম করে নারীকে পণ্যে রূপান্তরিত করেছে পশ্চিমা নারীবাদীরা। এ ক্ষেত্রে বাংলাদেশের কথা সাহিত্যিক সেলিনা হোসেন-এর দৃষ্টিভঙ্গির মিল আছে। অন্যদিকে সত্যের প্রতি অবিচল থেকে ফর্‌রুখ আহমদ নারীর মর্যাদাকে প্রতিষ্ঠিত করার আহ্বান জানিয়েছেন। তাই এ গবেষণা পত্রের মূল লক্ষ্য হলো ফর্‌রুখ আহমদ-এর 'মৃত-বসুধা' ও সেলিনা হোসেন-এর 'বৈশাখী গান' গল্পের বিভিন্ন দিক বিশ্লেষণের মাধ্যমে সমাজে তথাকথিত নারীবাদীদের দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরা যাতে সমাজে বিদ্যমান নগ্নতাবাদ সম্পর্কে পাঠক সচেতন হয়ে ওঠে এবং সমাজের অস্থিরতাকে দূর করতে পারে।

মূল শব্দসমূহ: নারীবাদ, নগ্নতাবাদ, সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি এবং নৈতিকতা।

ভূমিকা

বিংশ শতাব্দী নানা কারণেই পৃথিবীকে বেশ জোরে নাড়িয়ে দিয়েছে। বিশেষ করে পূর্ববর্তী চার শতক ধরে সাম্রাজ্যবাদের যে বিস্তার বিশ্বব্যাপী ঘটেছিল তার বিরুদ্ধে এক দিকে শোষিত মানুষের সশস্ত্র লড়াই, অন্য দিকে উপনিবেশিত অঞ্চলের কিছু মানুষ পশ্চিমা শিক্ষা গ্রহণ করে তাদের মূল উদ্দেশ্যকে আত্মস্থ করে নিজস্ব ডিসকোর্স চালুর মাধ্যমে উপনিবেশের বিরুদ্ধে লড়াই শুরু করতে পথ দেখিয়েছিল। পৃথিবীর চরম পরাক্রমশালী দেশসমূহ যেমন নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের জন্য প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ করে পৃথিবীকে ধ্বংসের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গিয়েছিল, তেমনি তাদের অর্থায়নের সেসব দেশের বুদ্ধিজীবীরা নতুনভাবে সাম্রাজ্যবাদী আধিপত্যকে আরো বিস্তৃত এবং কর্তৃত্বকে ধরে রাখার জন্য নতুন নতুন ডিসকোর্স নিয়ে উপস্থিত হয়। নারীবাদী ডিসকোর্স তেমনি একটি। যেখানে নারীদেরকে পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে।

* মোহাম্মদ জসিম উদ্দিন, সিনিয়র লেকচারার, ইংরেজি বিভাগ, নর্দান ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ, E-mail: jashimnub@yahoo.com

কেবল তাই নয়, সেসব ডিসকোর্স চালু করে উপনিবেশিত দেশসমূহে নারীদের অধিকার আদায়ের আন্দোলনের মাধ্যমে সামাজিক রীতিনীতিকে ধ্বংস করে দিতে এবং নারীর মর্যাদাকে ভুলণ্ঠিত করতে বেশ সক্রিয় রয়েছে। তাছাড়া এ তথাকথিত নারীবাদ কেবল পুঁজিবাদকেই সম্প্রসারণ করেনি বরং নিজস্ব ধ্যান-ধারণাকেও আঘাত করে পশ্চিমা বিশ্বাসে বিশ্বাসী করে তুলে পশ্চিমা দাসে শৃঙ্খলিত করতে ইন্দন যুগাচ্ছে। যার ফলে নারীদের মধ্যে সামাজিক বৈষম্য উত্তরোত্তর বেড়ে চলেছে।

আর এ ধারাকে সামনে এগিয়ে নিতে এদেশিয় কিছু বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিক বেশ নিষ্ঠার সাথে কাজ করেছেন, যেমন ড. আহমদ শরীফ, ড. হুমায়ূন আজাদ, তসলীমা নাসরিন, পূরবী বসূ, সৈয়দ সামছুল হক, সেলিনা হোসেন এবং আরো অনেকে। এদের মধ্যে সেলিনা হোসেন অন্যতম। গত শতাব্দীর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সমাজের যে নৈতিক ভিত নষ্ট হয়ে গিয়েছিল ফলে নারী ও পুরুষ তথাকথিত আধুনিকতার আড়ালে নিজেদের পশু তুল্য করে তুলেছে তার ভয়াবহতা সম্পর্কে কেউ কেউ বেশ সজাগ ছিল। ফর্‌রুখ আহমদ তাদের একজন। তার লেখনিতে নারীবাদী আন্দোলনের প্রাথমিক দিকে গড়ে ওঠা নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি জায়গা করে নিয়েছে। ফলশ্রুতিতে নারীবাদ ও আদর্শবাদের সংঘর্ষ সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে ফর্‌রুখ আহমদ-এর লেখায়। সেলিনা হোসেন-এর লেখায় নারীবাদী আন্দোলনের আড়ালে নগ্নতাবাদকে প্রতিষ্ঠিত করার সুস্পষ্ট লক্ষণ ফুটে ওঠে।

লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য

এ গবেষণা পত্রের মাধ্যমে পশ্চিমা ধ্যান-ধারণা ও বিশ্বাসে গড়ে ওঠা তথাকথিত নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গিকে বিশ্লেষণ করা এবং সেসব নারীবাদী কর্মকাণ্ড কিভাবে সমাজে বিদ্যমান নারী-পুরুষের নৈতিকতাকে গ্রাস করে নগ্নতাকে কায়েম করেছে বা করে তা দেখানো হয়েছে। ফলে, উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে ফর্‌রুখ আহমদ-এর 'মৃত-বসুধা' ও সেলিনা হোসেন-এর 'বৈশাখী গান' গল্পের বিষয়বস্তু ও আঙ্গিককে বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রকৃত রূপ তুলে ধরা হয়েছে। এ বিশ্লেষণের মাধ্যমে পাঠকসমাজ পশ্চিমা নারীবাদের প্রকৃত রূপ অনুধাবনের মাধ্যমে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তন বা নিজেদের করণীয় ঠিক করতে সক্ষম হবে।

কর্ম পদ্ধতি

এখানে প্রাথমিক উৎস ও দ্বিতীয় উৎসকে ব্যবহার করা হয়েছে। যেমন ফর্‌রুখ আহমদ ও সেলিনা হোসেন-এর মূল লেখা প্রাথমিক উৎস এবং বাংলা ও ইংরেজি বই এবং বিভিন্ন জার্নাল-গবেষণা পত্র দ্বিতীয় উৎস। পাশাপাশি বিভিন্ন পত্র-পত্রিকা ও ম্যাগাজিনে লিখিত নারীবাদী চিন্তাসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। তবে প্রতিটি ক্ষেত্রেই বাংলাদেশের নিজস্ব সামাজিক প্রেক্ষাপট ও সাংস্কৃতিক অবস্থানকে প্রাধান্য দিয়ে উৎসসমূহকে ব্যবহার করা হয়েছে। এছাড়াও সংক্ষিপ্তভাবে নারীবাদের সংজ্ঞা যেমন দেয়া হয়েছে তেমনি গল্প দুটির বিষয়বস্তুও তুলে ধরা হয়েছে। ফলে বিষয়বস্তুর মাধ্যমে গল্পসমূহের নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ফোটে উঠেছে।

নারীবাদ

বর্তমান বিশ্বে আধুনিকতাবাদ ও উত্তর-আধুনিকতাবাদের মধ্যে যে দ্বন্দ্ব তাকে ছাড়িয়েও নারীবাদ বেশ আলোচিত প্রাসঙ্গিক কারণে। তথাপি নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গি ও এর উদ্দেশ্য নিয়ে মতবিরোধ রয়েছে। কেননা, পূর্ব-পশ্চিম তথা ন্যায়-অন্যায় বা ন্যায়বোধ ও উশৃঙ্খলতার বিরোধ প্রকট। তবে 'দার্শনিক দিক থেকে বলা যায় যে, নারীবাদ

কেবলমাত্র নারীর সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকারকে বুঝায় না, নারী সত্তার বোধ ও স্বরূপ উন্মোচন করার দিকটিও গুরুত্বপূর্ণ' (খানম, ২০১৪: ২৩৯)। যার প্রেক্ষিতে,

> নারীবাদকে তাই নারীসত্তার সচেতনতা বিষয়ক মতবাদ হিসেবেও বিবেচনা করা যায়।... নারীর মাঝে স্বসত্তার চেতনা জাগ্রত করা নারীবাদের অন্যতম লক্ষ্য।... নারীর প্রতি বৈষম্যমূলক আরচণকে মূলোৎপাটন করা নারীদের আদর্শ। ...নারীবাদ পুরুষ বিদ্বেষী কোনো মতবাদ নয়; নারীর পশ্চাৎপদতা, নারীর অধিকারহীনতা, তার বঞ্চনার কারণ অন্বেষণ করা ও সেগুলো মোচন করার পন্থা বের করা নারীবাদের উদ্দেশ্য (খানম, ২০১৪: ২৩৯)।

কিন্তু এ নারীবাদী আন্দোলনেরও বিশাল ইতিহাস এবং ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি রয়েছে। নারীবাদী আন্দোলনের সূত্রপাত হয় মূলত 'নারী নির্যাতনের ইতিহাসকে ... তুলে ধরে, পরিবারের ভেতর কন্যা-শিশু ও পুত্র-শিশুর প্রতি যে বৈষম্যমূলক আচরণ শিকড় গেড়ে বসেছে এ বিষয়টিকে প্রতিহত করার প্রয়োজনীয়তাকে আন্দোলনে অগ্রাধিকার দেয়া হয়েছে। ...সহজভাবে বলা যায় যে লিঙ্গ সমতার ভিত্তিতে নারী অধিকারকে সমর্থন করাই হচ্ছে নারীবাদ' (খানম, ২০১৪: ২৩৯)।

কোনো কোনো নারীবাদী মনে করেন, 'নারী সমাজকে প্রগতিশীল কার্যক্রম থেকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্যে সূক্ষ্ম কৌশলে সমাজ-নারীকে আত্ম-সম্মান গড়ে তুলতে বাধা দেয়' (Sanford & Donowan, 1985: XIII)। অথচ 'আত্ম-সম্মান ও আত্ম-বিশ্বাস তাই এক অর্থে অভিন্ন, কেননা আত্ম-সম্মানের ঘাটতি হলে ব্যক্তির মাঝে হীনমন্যতা স্থান পায়, হীনমন্যতা ব্যক্তিকে দুর্বল করে ব্যক্তিত্বহীন পশ্চাৎপদ করে তোলে' (খানম, ২০০৫: ৫৩)। এছাড়াও 'আত্ম-সম্মান সম্পর্কে দার্শনিক ব্যাখ্যা হলো এই যে এটি একটি নৈতিক প্রত্যয়, নিজের মর্যাদা রক্ষা করা নৈতিক দায়িত্ব, এটি এমন দায়িত্ব যা ব্যক্তি স্বয়ং 'ব্যক্তি' হিসেবে পালন করবে' (খানম, ২০০৫: ৫৪)। এ প্রসঙ্গে টি. মিয়ার্স বলেন, 'সম্মান একটি ত্রিমূখী সম্পর্ককে বুঝায়' (Meyers, 1995: 223)। তাঁর মতে সম্মানের তিনটি উপাদান রয়েছে। সম্মানের এই তিনটি উপাদান হলো– 'দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ এবং লক্ষ্যবস্তু' (Meyers, 1995: 223)।

এ আত্মসম্মান এবং নৈতিকতার উপর এত জোর দেয়া হচ্ছে কারণ বর্তমানে সর্বত্র যে অমানবিক ও পাশবিক কর্মকাণ্ড চলছে তার উৎস বুঝতে। ফলে, বর্তমান সময়ে নারী-পুরুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা এবং অবাধ দৈহিক চাহিদা পূরণের আড়ালে যে নির্মমতা পৃথিবী অবলোকন করছে, তা মানুষের শ্রেষ্ঠত্বকে প্রশ্নবিদ্ধ করে পশুর চেয়েও অধম বানাতে সহায়তা করছে। অথচ প্রকৃত সত্য হচ্ছে, 'আত্ম-সম্মান রয়েছে এমন ব্যক্তি সচরাচর অনৈতিক বা অসামাজিক কার্যকলাপে লিপ্ত হয় না, বরং তাদের জীবন সুশৃঙ্খল পরিকল্পনা দিয়ে পরিচালিত হয়। উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে আমরা এটা বলতে পারি যে, আত্ম-সম্মান স্বতঃমূল্য এবং সহায়ক মূল্য উভয়ভাবে গুরুত্বপূর্ণ' (Meyers, 1995: 245) এবং 'আত্মসম্মান যে ব্যক্তির রয়েছে তিনি দাস বা ক্রীতদাস নন, তিনি স্বেচ্ছায় বশ্যতা স্বীকার করেন না, বা স্বাধিকার লুণ্ঠিত হয় এমন কিছুতে মৌন সম্মতি দেন না বরং নিন্দনীয় হীনমন্য আচরণ তথা কাজকে প্রতিরোধ করেন' (Meyers, 1995: 245)।

বাস্তবে নারীবাদী আন্দোলনের দৃষ্টিভঙ্গিতে যে বিরোধ বা পার্থক্য রয়েছে, তার মূল কারণ দু'টি: এক, বিংশ শতাব্দীতে একে একে সাম্রাজ্যবাদের পতনের ফলে পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদীরা 'অন্যদের' ওপর শোষণ ও শাসনের যে স্বাদ পেয়েছে তা ভুলতে পারেনি, বরং আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে নব্য সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবাপন্ন হয়ে 'অন্যদের'

ওপর সাংস্কৃতিক 'হেজেমনিক' সৃষ্টি করে, তাদের স্বার্থ চরিতার্থের কৌশল হিসেবে এসব আন্দোলনকে ব্যবহার করেছে। যার প্রভাব আমাদের সমাজেও বিদ্যমান। দুই, পুঁজিতান্ত্রিক বুর্জুয়া সমাজ বাস্তবায়নে 'বিশ্বায়নের বিষাক্ত ছোবলে আজ শিক্ষা সংস্কৃতি ও সামাজিক অঙ্গনকে জর্জরিত করে তুলছে। ধ্রুপদী সুস্থ সংস্কৃতির বিপরীতে ভোগবাদী পণ্য সংস্কৃতিকে উপজীব্য করে বাজারী সংস্কৃতিকে চাপিয়ে দেবার প্রক্রিয়াও চলছে। তরুণ প্রজন্মকে যৌনতা এবং হিংসাশ্রয়ী বিকৃত সংস্কৃতির ঘেরাটোপে আবদ্ধ করতে উদ্যত সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। বাজার অর্থনীতির মতই বাজার সংস্কৃতির অখণ্ডন নিয়ন্ত্রণ চায় ধনবাদী দেশগুলো' (গুপ্ত, ২০০৭: ১০)।

ফলে পশ্চিমা নারীবাদীরা নারীর হারিয়ে যাওয়া সম্মান বা নারীর ভূলণ্ঠিত স্বাধীনতা ও অধিকারকে উদ্ধার নয় বরং উচ্চ শ্রেণির নারী গোষ্ঠীর স্বার্থকে চরিতার্থ করতে সচেষ্ট।

আর এ নৈতিকতার কথা বলতে 'নৈতিক জীবন প্রেম, বন্ধুত্ব, সদগুণপূর্ণ আচরণকে বুঝায়' (খানম, ২০০৫: ১৫)। যদিও এক্ষেত্রে অস্থিত্ববাদীরা বলে থাকেন নৈতিকতাবোধ ধর্মের নিরর্থক কথা এবং তা মানুষের ব্যক্তি স্বাধীনতা হরণের জন্য যথেষ্ট। প্রকৃত পক্ষে 'ব্যক্তির স্বাধীনতা সার্বিক মঙ্গল থেকে অর্জিত হয় বলে ব্যক্তির স্বাধীনতা সমষ্টির কল্যাণের অধস্তন বলে স্বীকৃত রয়েছে' (খানম, ২০০৫: ১৫)। আর লরেন্স কোলবার্গ মনে করেন, 'নৈতিক সিদ্ধান্ত সমাজ চাপিয়ে দিচ্ছে না, কিন্তু নৈতিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে একই সাথে ব্যক্তি সমাজের বাধ্যবাধকতার বাইরে যৌক্তিকভাবে স্থান দিচ্ছে' (খানম, ২০০৫: ৫৪)।

এ সব বিষয়গুলির সাথে আরেকটি বিষয় বিবেচনায় নিতে হবে তা হলো, পশ্চিমাদের 'জেন্ডার' এবং প্রাচ্যের 'লিঙ্গ'-এর মধ্যে ব্যবহারগত পার্থক্য ও এদের প্রয়োগগত যে ভিন্নতা আছে। এ পার্থ্যক না বুঝার কারণেও নারীবাদ নিয়ে মাঝে মাঝে বিভ্রান্তি তৈরি হয় এবং পশ্চিমা ধারণাকেই একমাত্র জ্ঞানভাষ্য হিসেবে মেনে নেই। প্রকৃত অর্থে-

> জেন্ডার ও লিঙ্গ-এর পার্থক্য হল এই যে প্রথমটি জীবতাত্ত্বিক, দ্বিতীয়টি সামাজিক ও সাংস্কৃতিক। জীবতাত্ত্বিক পার্থক্য প্রকৃতিপ্রদত্ত কিন্তু সাংস্কৃতিক পার্থক্য সমাজের মনগড়া। আশ্চর্যজনক হলেও এটা তো সত্যি যে, দুটোকে এক করে এ পার্থক্য দিয়ে নারীকে নিগৃহীত করা হচ্ছে। ...বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠা করাই হচ্ছে তত্ত্বগুলোর উদ্দেশ্য এবং এ উদ্দেশ্য তত্ত্বগুলো নারী-পুরুষ বৈষম্যের শিকড় কোথায় তা অন্বেষণে নিয়োজিত (খানম, ২০১৪: ২৪৫)।

অতএব, অন্য অর্থে নারীবাদ হচ্ছে নারী এবং পুরুষের মধ্যে শারীরিক তথা বায়োলজিক্যাল বৈষম্যের অবসান ঘটানো এবং পারস্পরিক সৌহার্দতাকে বৃদ্ধি করে পরস্পরের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা এবং পারস্পরিক সহযোগিতা ও সহমর্মিতার মাধ্যমে সমাজের চলমান লৈঙ্গিক ব্যবধানকে মুচে ফেলা। এছাড়া যেখানে পুরুষতান্ত্রিক সমাজ তথাকথিত ধর্মের মাধ্যমে নারীকে কেবল পুরুষের ভোগ্য পণ্য করে তুলে এবং নারীকে কেবল সন্তান ধারণের একমাত্র যোগ্যতার মোড়কে আবদ্ধ করে রাখে, তার বিরুদ্ধে কথা বলাই নারীবাদীদের কর্তব্য (এঙ্গেলস, ২০০৩: ২৭)। নারীবাদের খোলসে লুকিয়ে থাকা পুঁজিতান্ত্রিক নব্য সাম্রাজ্যবাদীরা সাংস্কৃতিক হেজেমনির মাধ্যমে নারীকে বর্তমান সমাজে কেবল মাত্র নিকৃষ্ট পণ্য হিসেবে গণ্য করে। এর বাস্তব উদাহরণ হলো: এক, দেশে দেশে সুন্দরী প্রতিযোগীতার আয়োজনের মাধ্যমে অংশগ্রহণকারী নারীদের অপমান করা এবং শরীরের রঙের ভিত্তিতে নারীতে নারীতে বিভেদ তৈরা করা (নায়ের, ২০১১: ৮৯; Hannan, 2016:103)। দুই, চলচিত্রের মাধ্যমে

নারীকে কেবল পুরুষের যৌন সুখের বস্তুতে উপস্থাপন করা এবং পুরুষের উপর নির্ভরশীল অবলা প্রাণিতে পরিণত করা। তিন, বিভিন্ন বিজ্ঞাপন দৃশ্যে অযাচিত নারীর উপস্থাপন ও যৌন আবেদনময় উপস্থাপনার মাধ্যমে নারীকে বেশ্যা বা গণিকা হিসেবে উপস্থাপন করা (Hannan, 2016: 21)। চার, বিভিন্ন মিছিল মিটিং-অনুষ্ঠানে নারীকে সামনে রেখে ঢাল হিসেবে উপস্থাপনের চেষ্টা এবং তাদের বাহ্যিক সৌন্দর্য্যের আড়ালে জন সমাবেশ বাড়ানো এবং পণ্যের অবাদ বিক্রি নিশ্চিত করা। পাঁচ, তথাকথিত সেল্‌ফি তোলার সময়ে নারীর শরীরের উত্তাপকে অনুভব করার প্রবণতা। এসব কেবল নারীকে তার অধিকার থেকে বঞ্চিতই করে না বরং নারীর আত্ম-সম্মান ও নিজস্বতাকে সংকুচিত করে এবং দৈনন্দিন ভোগ্য পণ্যের কাতারে ঠেলে দেয় (Hasan, 2013: 84)। সুতরাং নারীবাদ 'যেখানে আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা ঘটবে নারী পুরুষের সম্মিলিত প্রয়াসে সেখানে নারীত্ব অপমানিত হবে না সন্তান ধারণের যন্ত্র হিসেবে, কিংবা কোনো নৃশংস পিতা বা স্বামীর লোভের আগুন স্পর্শ করবে না' (চক্রবর্তী, ২০১৫: ৪১৬)।

পশ্চিমা নারীবাদের আরেকটি ভ্রান্ত দিক হলো জীবনের শুরু থেকেই নিজেদের নারী ভাবতে ঘৃণা করতে শিক্ষা দেয়া এবং পুরুষদের বিরুদ্ধে কথা বলার বিষয়ে অনুপ্রাণিত করা কিন্তু সময়-সুযোগে নিজেদের পুরুষালী উপাধি গ্রহণ করার প্রবল প্রবণতা। যেমন, একজন নারীবাদী নারী নিজেকে 'সভানেত্রী'র পরিবর্তে 'সভাপতি', 'লেখিকা'র পরিবর্তে 'লেখক', 'শিক্ষিকা'র পরিবর্তে 'শিক্ষক' এবং 'অভিনেত্রীর' স্থলে 'অভিনেতা' ভাবতে ও বলতে ভালো বোধ করেন। এ যে প্রবণতা তা কেবল নারীকে অপমানই করে না বরং নারীর ব্যক্তিত্বকেও যে খাটো করে তা বুঝার বা বুঝানোর ক্ষমতাও নস্যাৎ করে। এ প্রসঙ্গে সাহিত্য সমালোচক জুলফিকার মতিন নারীবাদী লেখিকাদের মনোভাব ও ইচ্ছাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে বলেন, 'নারী-যারা লেখেন, তারা আর নিজেদেরকে লেখিকা বলতে চান না, লেখক বলেন' (মতিন, ২০১৫: ৫৭)। তিনি উদাহরণস্বরূপ আরো বলেন,

> কাজেই, এখন... কে আমি যদি লেখিকা বলি, শুধু তিনি কেন, তাবৎ নারীরাও হতে পারে, পুরুষেরা পর্যন্ত কুপিত হতে পারে। আর সে জন্যই নিজের আত্মরক্ষারও একটা ব্যবস্থা করে রাখতে চাই। আমি নিজে মনে করি, মানবপ্রজাতির বৈজ্ঞানিক বিভাজনটা বায়োলজিক্যালই হওয়া উচিৎ। আমি বাঙালি, তুমি বৃটিশ, তুমি কুর্দি, তুমি ফরাসি, এবং আরও আরও যে নামকরণ কিংবা হিন্দু, মুসলমান, বৌদ্ধ, খ্রিষ্টান ইত্যাদি যে পরিচয়, তা তো ভৌগোলিক অবস্থানগত ও সংস্কৃতিগত। জীবনযাত্রার ধরন ও চিন্তার যে রকম ফের, তা তো হয়ে থাকে প্রাকৃতিক ও পরিবেশগত বিভিন্নতার কারণে (মতিন, ২০১৫: ৫৭-৫৮)।

ফর্‌রুখ আহমদ-এর 'মৃত-বসুধা' ও সেলিনা হোসেন-এর 'বৈশাখী গান'-এর বিষয়বস্তু

ফর্‌রুখ আহমদের 'মৃত-বসুধা' গল্পের মূল চরিত্র সোনারগাঁয়ের খোন্দকার আবদুর রউফ। তিনি যৌবনকালে অর্থ-ভিত্তের কারণে রাতকে দিন দিনকে রাত করতেন এবং তাঁর প্রতাপে আশপাশ গ্রামের কোনো নারীই বিশেষ করে সদ্য যৌবনা প্রাপ্ত নারী নিরাপদ ছিলনা। ঘরে স্ত্রী থাকার পরও যখন যাকে মনে ধরতো তখনই তাকে তুলে নিয়ে এসে ভোগ করতো এবং কেউ প্রতিবাদ করলেই সে ব্যাক্তির খুলি উড়ে যেত। ফলে কারো প্রবল ইচ্ছা থাকলেও এক সময় কেউ আর প্রতিবাদ করতো না। এর ধারাবাহিকতায় রাহেলা নামের এক তরুণীকে 'তাঁর পাপ-সহযাত্রীদের' সহযোগিতায় এক 'গভীর রাত্রে চুপি চুপি সিঁদ কেটে মুখে কাপড় দিয়ে চুরি করে এনেছে, লুণ্ঠন করেছে দেহ, পিষে ফেলেছে সকল আবেদন' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৭৭)। রাহেলার রূপ-যৌবন রউফ

সাহেবের ভালো লাগায় দিনের পর দিন ঘরে আটকে রেখেছে এবং নিজের মন বাসনাকে পূর্ণ করেছে। যদিও 'প্রথম প্রথম সে রউফ সাহেবকে প্রাণপণে বাধা দিতে চেষ্টা করত, কিন্তু তার ঘৃণা, অশ্রু, শারীরিক প্রতিরোধ কোনোটাই সে ক্ষেত্রে সফল হয়নি' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৭৮)। আবার 'আত্মহত্যা করতে পারে না' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৭৮) রাহেলা।

রউফ সাহেবের এমন কর্মকাণ্ডে দু'একজন প্রতিবাদও করেছে। কিন্তু 'তাদের ক্ষতিপূরণ দিতে হলো প্রচুর। গ্রামের মধ্যে কয়েকখানা ঘরপোড়ার পর সব প্রতিবাদ শীতল হয়ে গেল। মসজিদের মুন্‌শী সাহেবও বাদ গেলেন না এ আক্রমণ থেকে' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৭৭)। রউফ সাহেবের এমন কর্মকাণ্ডে মা এবং স্ত্রী সুফিয়া আরো ভেঙ্গে পড়লো এবং 'অবশেষে সুফিয়া একদিন সমস্ত লজ্জা শেষ করে দিল কেরোসিন তেল গায়ে ঢেলে আগুন জ্বালিয়ে' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৭৮)। আর কয়েক মাস পরেই রাহেলা 'বুঝতে পারল যে, তার শরীরে আর একটা জীবন আশ্রয় নিয়ে তিলে তিলে বেড়ে উঠেছে' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৭৮)। আশ্চর্যজনকভাবে এবার রাহেলা স্থির কেননা অনাগত শিশুটি কোনো পাপ করেনি। কেননা তার বেঁচে থাকার অধিকার আছে। আর সে অধিকার পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত রাহেলা কোনো কিছুই বুঝতে দিল না রউফ সাহেবকে। 'কিন্তু নিয়তি প্রতীক্ষা করছিল। সেদিন গভীর রাত্রে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল- রাহেলার ঘর থেকে অস্পষ্ট কান্নার শব্দ আসছে। মনে হয় যেন শিশু কণ্ঠের কান্না-সে আসতে চায়নি, তাকে কেনো জোর করে আনা হলো' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৭৮)! আর এ শিশুটিকে নিরাপধে জন্ম দিয়ে 'শাড়ির আঁচল বেঁধে রাহেলা ঝুলছে শূন্যে' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৭৯)!

বৃদ্ধ চাকরানি পাঁচীর মা নতুন সন্তান লতিফার দায়িত্ব নিল। কিন্তু রাহেলার ঝুলন্ত লাশ থেকে 'অস্বাভাবিক দীর্ঘ-বিলম্বিত জিভ বেয়ে ফোঁটায় ফোঁটায় রক্ত জরে পড়ছে' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৭৯)। তা দেখে অজ্ঞান হয়ে যায় রউফ সাহেব এবং জরাগ্রস্থ হয়ে অচল হয়ে যান চিরতরে এবং সব অরক্ষিত নারী নিরাপত্তায় চলাচলের সুযোগ পেয়ে গেলেন। গল্পকার এখানেই শেষ করেন নি। তিনি রউফ সাহেবের জীবদ্দশার করুণ পরিণতিও পাঠক সমাজে তুলে ধরেছেন। ছোট বেলা থেকেই 'লতিফা মুখ বাঁকিয়ে চলে যায়' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৮০) রউফ সাহেবকে দেখে। পরম মমতা নিয়ে লতিফাকে ঘুমন্ত অবস্থায় রউফ সাহেব আদর দিতে গেলে তার ঘুম ভেঙ্গে যায় এবং 'ক্ষিপ্ত কণ্ঠে সে চেঁচিয়ে ওঠে, এখানে এসেছেন আবার। আপনার জন্য কি ঘুমাতেও পারবো না' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৮০)?

প্রকৃত পক্ষে রউফ সাহেবের 'যৌবন-রক্ত কামনা আবর্তে ঘুরে তীব্র বেগে প্রবাহিত হচ্ছে তার শিরায়-উপশিরায়, ধমনীতে ধমনীতে' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৮১)। কিন্তু একটু বাড়ন্ত হয়ে ওঠলেই লতিফা বাপের সব স্বভাব চরিত্রকে চরিত্রার্থ করতে থাকে এবং এপাড়া ওপাড়ার যুবকদের সাথে মিশতে থাকে। বিশেষ করে 'ও-বাড়ির ফরিদের সাথে লতিফার অন্তরঙ্গতা শ্লীলতার সীমা ছাড়িয়ে উঠেছে। লতিফা খোন্দকার সাহেবের ভোগ-লিপ্সু যৌবন পেয়েছে উত্তরাধিকার-স্বত্বে' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৮২)। আর এমন পরিস্থিতিতেও 'রউফ সাহেবের বলার কিছু নাই- বলার কোনো অধিকার তিনি রাখেন নি বলেই। ন্যায়ের শাসন চালাতে গেলে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে যায়' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৮২)।

এক সময় লতিফা ঘর ছেড়ে পালায় দেহের টানে। সব হারিয়ে রউফ সাহেবের যৌবনের সঙ্গী বৃদ্ধ ঘোড়াটি একমাত্র অবলম্বন হয়ে ওঠে। এক রাতে নিঃস্ব অবস্থায় মারা যান তিনি। তার জীবনের শেষ দিনগুলি কেবল অসহায়ভাবে এবং লাঞ্ছিত হয়েই থাকতে হলো। কেউ পাশে দাঁড়ায়নি।

অন্যদিকে সেলিনা হোসেনের 'বৈশাখী গান' গল্পের মূল চরিত্র ইকতি। সীমানের সাথে তার বিয়ের চার বছর হয়েছে। বৃদ্ধ শ্বশুর, অসুস্থ শ্বাশুড়ির সাথে তার বসবাস এবং সীমান রাজশাহীতে কম বেতনে চাকুরি করে বলে স্ত্রীকে সাথে নিয়ে থাকতে পারে না। তার চেয়ে বাস্তব সত্য হচ্ছে সীমানের মা বেশ অসুস্থ। ফলে, ইকতিকে নিয়ে যাওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু সীমান 'ঈদের সময় বছরের কয়েকটা দিন মাত্র ছুটি' (হোসেন, ২০০৯: ২১) পায়। যার ফলে 'বছরে পনের দিনের জন্য এলে- এই অল্প ক'দিনে ইকতির দেহমন কোনোটাই তৃপ্ত হয় না' (হোসেন, ২০০৯: ২১)।

ফলে এবার ছুটি কাটিয়ে যাবার দিন সকালে ইকতি অনড় হয়ে থাকলো তাকে সাথে করে রাজশাহী নিয়ে যেতে হবে। আর সীমান এবারও নিরুপায়। কেননা একদিকে অল্প বেতন ও অন্যদিকে অসুস্থ মাকে একা ফেলে রেখে নিয়ে যেতে চাইলেও সম্ভব নয়। সে সকালে সীমানের মা বেশ অসুস্থ হয়ে পরলেও 'মাকে ধরার কোনো ইচ্ছে হলো না' (হোসেন, ২০০৯: ২২)। বরং অভিমানে ইকতি সীমানকে বলে বসল, 'তোঁর মারে সেবা করনের লাইনি আঁরে বিয়া কইচ্ছ? হেইডা তো ওগ্‌গা বান্দি রাইখলেই হাইত্যো' (হোসেন, ২০০৯: ২২)। ইকতির এমন কথাতে সীমান নিজেকেই অপরাধী মনে করলো এবং ভাবলো, 'সত্যি সারাদিন মার সেবা, বাবাকে দেখাশুনা, আরো ঝামেলায় একটু সময় পায় না ইকতি। অথচ এই উঠতি বয়সে কি এতটা ঝামেলা ভালো লাগে!' (হোসেন, ২০০৯: ২২) আর এসব অনুভূতি সীমানকে বেশ নাড়া দেয় ফলে সীমানের মনে হলো, 'বুড়ী যে মরে না ক্যান' (হোসেন, ২০০৯: ২২)?

সবকিছুকে চাপিয়ে সকালেই সীমান রাজশাহীতে চলে যায় কিন্তু 'ইকতির এই রূপ-সমৃদ্ধ দেহটা ছেড়ে যেতে যেন ভরসা হচ্ছে না সীমানের। পাড়া-গাঁ বড় খারাপ জায়গা' (হোসেন, ২০০৯: ২২-২৩)। তাছাড়া সারা পথে সীমান নিজের উপরই বেশি বিরক্ত হল, কেননা বিবাহের এতো দিন পেরিয়ে গেলেও স্ত্রীকে ঠিক মত সময় দেয়া হয়ে ওঠেনি। কিন্তু সীমানকে বিদায় দিয়ে আসার সময় 'ছাড়াবাড়ির মাঝামাঝি যেতেই সাজনের সঙ্গে দেখা। মসজিদের ইমামের ছেলে সাজন' (হোসেন, ২০০৯: ২৪)।

সাজন অনেকটা পথ আগলে ধরলো ইকতির। আজ ইকতি অতটা বিরক্ত নয় বরং 'ইকতি একটু রোমাঞ্চিত হলো। সাজনের সবটুকু দৃষ্টি তখন ইকতির মাথা থেকে পায়ের মধ্যে বিচরণ করছে' (হোসেন, ২০০৯: ২৪)। আর এর মধ্যে সীমানের চিঠির জন্য ইকতি ব্যাকুল হয়ে উঠে না। সে এখন 'ওই চিঠির চাইতে অনেক বেশি আকর্ষণ খুঁজে পায় সাজনের সেই অদ্ভুত শিস বাজানোর ভঙ্গিতে' (হোসেন, ২০০৯: ২৫)। কেননা এ সময়ে ইকতি সাজন একে অন্যকে সময় দিতে শুরু করেছে। সাজন এখন ইকতির এ যৌবনের সুঢৌল মৌচাকে নিয়মিত মধু খায়। ফলে ইকতির কাছে মনে হতে লাগল 'সীমানের সঙ্গে ও মিলিত হয় বছরে পনেরো থেকে কুড়ি দিনের মতো। নিদেনপক্ষে একমাস। তারপর? নিজেকে এমনিভাবে বিশ্লেষণ করে নিজের কোনো দোষ খুঁজে পায় না ইকতি' (হোসেন, ২০০৯: ২৫)।

নিজেকে সাজনের মধ্যে আবিস্কার করতে পেরেছে বলে ইকতির অনুভূতি বেশ আনন্দের। তাই তাকে বলতে শুনি, 'সাজন, সাজন, সাজন- নামের মধ্যেও একটা ঝঙ্কার আছে। ওই জোয়ান তাগড়া শরীরের ঝাঁকুনিতেও একটা মাদকতা আছে। কতদিন সাজন ওকে দু'হাতে জড়িয়ে ধরেছে-কত আদর করেছে ঠোঁটে, গালে, মাথায়। খুব একটা খারাপ লাগতো না ইকতির। শরীর কেমন একটা ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে যেত, তাতেই বড় আনন্দ ওর'

(হোসেন, ২০০৯: ২৫)। কিন্তু এ মহামিলনের মধ্যে ইকতি একটু-আধটু অজানা আশঙ্কায় কেঁপে ওঠলেই সাজন আশ্বস্ত করে বলতো, 'তোঁর এইসব সখ আছে দেইয়ে ত তুঁই মানুষ। আর মাইয়া মানুষের এরূপ সখ একটু বেশিই থাকে' (হোসেন, ২০০৯: ২৫)। এ আশঙ্কার মাঝে 'দেহে তার নবজীবনের বারতা ইকতি অনুভব করল জীবনের মোড় ঘুরতে শুরু করেছে' (হোসেন,২০০৯: ২৬)।

আর এ নবতর প্রাণের উপস্থিতিতে ইকতি 'কিন্তু ঠিক ঘৃণা হচ্ছে না। ইকতি আশ্চর্য হলো নিজেকে সে ঘৃণা করতে পারছে না, এমনকি সাজনকেও না' (হোসেন, ২০০৯: ২৬)। ইকতি ছুটে যায় সাজনের কাছে। সাজন ভয় পেয়ে যায়। পরে পরামর্শ দেয় গর্ভপাতের। কিন্তু ইকতি এতে রাজি নয়। বরং ইকতি নিজেই সব দায়িত্ব ঘাড়ে নিয়ে সাজনের কাপুরুষচিত কর্মকে দূরে ঠেলে সাজনকে আশ্বস্ত করে সে না চাইলে এ অনাগত সন্তানের পিতৃপরিচয় সে কাউকে বলবে না। কিন্তু এ বাড়ন্ত শরীরের পরিবর্তনের কথা দিনে দিনে একান ওকান করে সব পাড়ায় পৌঁছে যায়। আর মসজিদের ইমাম সাহেব এ সংবাদ শুনে 'ছুটে ওর শ্বশুরের কাছে। যা তা বলল। এমন নষ্টা মেয়ে লোক নিয়ে এ বাড়ি ছাড়তে হবে। নইলে সব কথা প্রকাশ করে সমাজের কাছে মাপ চাইতে হবে' (হোসেন, ২০০৯: ২৮)। যাওয়ার সময় ইমাম সাহেব অশ্রাব্য ভাষায় গালাগাল করলো। ইমাম সাহেবে এমন বিশ্রি গালি শুনে 'কেঁপে উঠল ইকতি। যে মুখে কুরআনের আয়াতগুলো এত সুন্দর করে বের হয় সে মুখ কত জঘন্য। যেন একটা দুর্গন্ধ বের হয়ে আসছে' (হোসেন, ২০০৯: ২৮)।

সাজন ইকতির সব আচরণের কথা জানতে পারলো। বিশেষ করে তার বাবাকে যেভাবে অপমান করেছে, তা সে জানতে পেরে বেশ আনন্দিত হয়েছে। তাছাড়া 'যেদিন বাবাকে অপমান করেছে সেদিন যেন একটু শান্তি পেয়েছিল সাজন। মনে হয়েছিল ইকতি আরো অপমান করুক। সবাইকে করুক। আর তার ঢেউ এসে লাগুক সাজনের গায়ে' (হোসেন, ২০০৯: ২৯)। কোনোভাবে ইকতি তার গর্ভে আগত সন্তানের পিতৃপরিচয় কাউকে না বলায় মসজিদের ইমাম সাহেব একদিন গ্রাম্য সালিশের আয়োজন করলেন। সীমানের বাবা কোনো পক্ষই অবলম্বন করেনি বলে তিনি বিচারের সময় ঘর ছেড়ে অন্যত্র চলে গেলেন কিন্তু অসুস্থ শ্বাশুড়ি বিছানায় থেকে কেবলই দীর্ঘ নিঃশ্বাস ছাড়ছেন। ইকতির কাছে সালিশের আগ মুহূর্তে বড় একা মনে হলো কিন্তু সাহস হারায়নি। তার নিজের কাছে মনে হলো, 'সে কি অন্যায় করেছে? পেটের মধ্যে একটা সজীব নিস্কলঙ্ক প্রাণের অস্তিত্ব যদি এতই অবাঞ্ছিত হয়, তবে তো মানুষের জন্মের মধ্যে কোথাও সত্য আছে বলে মনে হয় না। প্রতিটি মানুষের জন্মেই পাপে ভরা' (হোসেন, ২০০৯: ২৯)।

সালিশের আয়োজক হিসেবে মসজিদের ইমামই কথা শুরু করলো। কিন্তু কথায় কথায় তিনি অশ্রাব্য শব্দ ব্যবহার করছিলেন বলে কেউ একজন ইমাম সাহেবকে লক্ষ্য করে বললেন, 'ভালা করি কথা কন ইমাম সাহেব। গাল মন্দ করেন কিয়ার লাই' (হোসেন, ২০০৯: ৩০)। কিন্তু ইমাম সাহেব অপরিবর্তিত থেকে গর্জে উঠে জিজ্ঞেস করেন 'এ্যাই...ক তোর হোলার বাপ কে? হেরপর আমরা ইগারেই মাথায় চুনকালি দি বার করি দিমু' (হোসেন, ২০০৯: ৩০)। কিন্তু নির্লিপ্ত ইকতি ভাবলেশহীন। বেশ চাপাচাপির পর উল্টো প্রশ্ন করে বসলেন, 'তার আগে কন আনের বাপ কে? আপনে যে কাজেম মিয়ার হোলা হেইডা আপনে কেমনে জাইনলেন? কাজেম মিয়া যে আপনের বাপ তার হরমান কি?' (হোসেন, ২০০৯: ৩০)। স্তম্ভিত সবাই। নির্বাক। অতএব নীরবতা ভেঙ্গে ইকতির সাহস দেখে গুঞ্জন শুরু হলো। সবাইকে থামিয়ে ইকতি দৃঢ় কণ্ঠে ঘোষণা দিল, 'না। আঁই কোনো হাপ করি ন। আঁই যদি হাপ করি থাই তাইলে ঘরে ঘরে ব্যাকেই হাপ করে। আপনেরা কম করেন না' (হোসেন, ২০০৯: ৩০)।

সালিশ চলাকালিন সময়ে সীমান রাজশাহী থেকে চলে এসেছে এবং চুপ করে একপাশে বসে সব শুনল এবং তার মনে হল, 'ইকতিকে যে অবস্থায় রেখে গিয়েছিল সেই অবস্থায় ইকতি নাই' (হোসেন, ২০০৯: ৩০)। সীমানের আরো মনে হল 'ভাদ্রের ভরা নদীর মতো ইকতির যৌবন। এই যৌবন নিয়ে ও নির্বিবাদে চার বছর ঘর করেছে। আজ যদি ও একটি ভুল করে তার কি ক্ষমা নেই? নিশ্চয় আছে' (হোসেন, ২০০৯: ৩০)। সীমান নিজেকে ধীরে ধীরে শক্ত করলো এবং ইকতির এ অবস্থার জন্য নিজেকে দায়ী করে সালিশের উদ্দেশ্যে বলে বসল, 'আপনেরা হেরে ইয়ান আইনছেন কিয়ার লাই? হে যদি কোনো দোষ করে তার শাস্তি আঁই দিউম! আপনেরা কে? ...কিয়ের লাই কইতাম না। হে আঁর বিয়া করা বউ। ...দরকার নাই। হের হ্যেডে হোলাই থাক, হে মাইনষের হোলা' (হোসেন, ২০০৯: ৩০)। এভাবেই শেষ হয় গল্পটি।

গল্প দু'টির দৃষ্টিভঙ্গি ও বিশ্লেষণ

গল্প দু'টিতে বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজের নারী-পুরুষের জৈবিক সম্পর্ক ও আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটেছে। ফর্‌রুখ আহমদ-এর গল্পটিতে তথাকথিত নারীবাদীদের দৃষ্টিতে নারীর প্রতি অবিচার অন্যায় ও অবমূল্যায়ন করা হয়েছে। কেননা সেখানে নারীর স্বাধীনতা হরণ করা হয়েছে এবং নারীকে ভোগ্য পণ্য হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে। অন্যদিকে সেলিনা হোসেন-এর গল্পের নারীকে বন্দি দশা থেকে সাহসীকতার সাথে প্রতিবাদী হয়ে উঠতে দেখি এবং নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছার প্রতি শ্রদ্ধাশীল হতে শিখিয়েছে। কেবল তাই নয় সেলিনা হোসেন-এর গল্পটির বিষয়বস্তুতে মানবতাকেই জয়ী হিসেবে দেখানো হয়েছে।

অন্যদিকে সাজন দায়িত্ব নিতে অস্বীকার করে এবং ইমামের ডাকা গ্রাম্য সালিশে ইমাম অশ্রাব্য ভাষায় ইকতিকে গালি দিলে ইকতি প্রতিবাদ করে। গ্রামের সকল মানুষ ইকতির বিচার চায়। এমন সময় সীমান শহর থেকে ফিরে এসে সোজা চলে আসে শালিসী মজলিসে প্রতিবাদ করে। পশ্চিমা নারীবাদীদের দৃষ্টিতে এটি মানবতার পক্ষে দৃঢ় উচ্চারণ কেননা মানুষে মানুষে যে দৈহিক মিলন ও সুখ তাই যথেষ্ট। সেখানে বৈধ বা অবৈধ সম্পর্ক বলে কিছুই নেই। তাই গ্রামীণ জনপদের নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের নিগৃহীত নারীদের পক্ষে দাঁড়িয়ে দ্রোহের আগুন জ্বেলে দেয়া এবং নিয়তির গালে চড়-থাপ্পর মারা। এমনি করে গল্পকার 'সেলিনা হোসেন সমাজবাস্তবতা ও তার অভ্যন্তরীণ অসংগতি তুলে এনে তাঁর গল্পে মানবিকতার আলো জ্বেলে দেন। তাঁর গল্প হয়ে ওঠে মানবিকতার আলোকবর্তিকা' (জোয়ারদার, ২০১৫: ৩২৮)।

এবার গল্প দু'টির মানবতাবোধ ও নীতিবোধের দিকে খেয়াল করা যেতে পারে, যার মধ্য দিয়ে নারীর সম্মান ও স্বাধীনতা এবং সমাজের নিয়ন্ত্রণ কর্তা হিসেবে পুরুষতান্ত্রিক যে মনোভাবের কথা বলা হয় তাও ফোটে উঠবে।

ফর্‌রুখ আহমদ-এর গল্পে মহাপ্রতাপশালী চরিত্র খোন্দকার রউফ সাহেব। নিঃসন্দেহে রউফ সাহেব পুরুষতান্ত্রিক সমাজের প্রতিনিধিত্ব করেন, কেননা সমকালীন প্রেক্ষাপটে প্রতিপত্তি পুরুষেরা নারীদের যেভাবে ভোগের পণ্য বলে গণ্য করতেন রউফ সাহেবও রাহেলার ক্ষেত্রে তাই করেছেন। তাছাড়া স্ত্রীর প্রতি স্বামীর যে দায়িত্ববোধ রয়েছে, তা তিনি উপেক্ষা করেছেন। কিন্তু তার এমন আচরণকে সমাজ মেনে নেয়নি বলেই বারবার তার কর্মে প্রতিবাদী হয়েছে এবং আক্রান্ত হয়ে নিঃস্ব করেছে। পাশাপাশি, নারীর সাথে হেন কর্মকেও গল্পকার ঘৃণার দৃষ্টিতে উপস্থাপন করেছেন। এক্ষেত্রে প্রশ্ন উঠতে পারে রউফ সাহেবকে কেনইবা আইনের আওতায় এনে শাস্তির ব্যবস্থা করা যায়নি? কারণ, পুঁজিতান্ত্রিক সমাজের যে কূটকৌশল, তা ব্যবহার করে রউফ সাহেব নিজেকে অধরা রেখে

দিয়েছিলেন। অথচ, রউফ সাহেবের এ কর্ম যে নীতি বিবর্জিত এবং সামাজিক স্থিতিশীলতা ও সমাজের স্বাভাবিক বিকাশকে ধ্বংস করে দিয়েছে বলেই মহান সৃষ্টিকর্তার যে শাস্তির বিধান রয়েছে তা ভোগ করেছেন। এ জগতে পূর্ণ যৌবনেই তিনি জরাগ্রস্থ হয়ে পড়েন এবং বাকি জীবনে কেবল পশুর মত অসহায় জীবন ভোগ করেছেন। ফলে রউফ সাহেবের জীবন সায়াহ্নে যে হতাশা এবং বঞ্চনার সৃষ্টি হয়েছে তা দেখে গল্পের বক্তা মন্তব্য করেন, 'অনেকদিন আগে ঝড় উঠেছিল এদের জীবনে। সে ঝড় সম্পূর্ণ শান্ত হয়ে গেছে। তার দৌরাত্ম্য নাই, শক্তি নাই- এমনকি উপদ্রবের চিহ্ন পর্যন্ত নাই। ...অতীতের ভুলের জন্য এরা অনুতাপ করে কঠোর প্রায়শ্চিত্তের মধ্য দিয়ে, কিন্তু বুঝে না যে সে-অনুতাপ বার্ধক্যের–পাপের নয়' (আহমদ, ১৯৯৬: ৩৭৫)।

তাছাড়া গল্পে রউফ সাহেবকে 'চরিত্রহীন' বলা হয়েছে অর্থাৎ রউফ সাহেবের কর্মকে সমর্থন দেয়নি সমাজ। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হলো, রউফ সাহেবের কর্মকাণ্ডে স্ত্রী সুফিয়া ও নির্যাতিতা রাহেলা আত্মহত্যার মাধ্যমে এমন নোংরা কাজের প্রতিবাদ করে গেছেন এবং নারীর সম্মানকে অবিকৃত রেখে গেছেন। নারীবাদীরা যেমন মনে করেন নারীর শরীরের উপর তার নিজের অধিকার থাকবে তাও এর মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

অপরদিকে সেলিনা হোসেন নারীবাদীদের মোড়কে অবাধ যৌনাচারকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সমাজে মানবজাতির যে ক্রমবিকাশ পদ্ধতি তাকে কলঙ্কিত এবং মানবসত্তার যে বন্ধন ও পরিচয় তাকে পশুত্বের কাতারে নিয়ে এসেছেন। পশু যেমন নির্বিচারে এখানে সেখানে এবং যেকোনো প্রাণির সাথে যৌন কাজে লিপ্ত হয় বলে তাদের পিতা-মাতার পরিচয়ের প্রয়োজন হয় না, তেমনি ইকতি সাজনের সাথে যৌনমিলনের মাধ্যমে পৃথিবীতে যে সন্তান আগমনের বার্তা দিচ্ছেন তাকেও তার পিতৃপরিচয় থেকে বঞ্চিত হতে হয়। পশ্চিমা নারীবাদীরা নারীর অধিকার হরণের জন্য ধর্মীয় রীতি-নীতিকে দায়ী করে থাকেন এবং তারা ধর্মীয় অবাধ নিয়ন্ত্রেণের বিপক্ষে লড়াই করার কথা বলেন। যার ফলে এখানে সেলিনা হোসেন মসজিদের ইমাম সাহেবের মুখ দিয়ে অসংখ্য বার অশ্রাব্য শব্দ বের করেছেন। এর পাশাপাশি ইমাম সাহেব ও গ্রামের অন্যান্য পুরুষ মানুষের পিতৃপরিচয় নিয়ে কটাক্ষ এবং প্রশ্ন তোলার মাধ্যমে তিনি সমাজে পুরুষতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে লড়াইয়ের নামে মূলত মানবজাতির জন্মের যে বিশুদ্ধ প্রক্রিয়া রয়েছে তাকেও প্রশ্নবিদ্ধ করেছেন। অন্যদিকে, ফর্‌রুখ আহমদ-এর গল্পে মসজিদের মুন্‌শী সাহেব রউফ সাহেবের কর্মকাণ্ডকে প্রতিবাদ করে আক্রান্ত হয়েছেন। এটি স্বাভাবিকভাবে প্রমাণ করে ধর্মীয় আবরণে নারী নির্যাতনের কোনো সুযোগ নেই (Hasan, 2013: 83) এবং নারীবাদীদের সে অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেননা এ প্রসঙ্গে কুরআনে বলা হয়েছে,

> 'হে মানবজাতি, তোমাদের সেই প্রভুকে ভয় কর, যিনি তোমাদেরকে একজন মানুষ থেকে সৃষ্টি করেছেন' (সুরা আন নিসা, ৪: ১)।

পুরুষ কর্তৃক নারী নির্যাতনের কোনো সুযোগ নেই বলে রসুল সা. ঘোষণা করেন,

> 'নারীগণ পুরুষদেরই সহোদরা' (আহমদ, আবু দাউদ ও তিরমিযি)।

নারীবাদী দৃষ্টিভঙ্গির প্রধান কাজ যদি নারীকে সম্মান করা হয়, তবে সীমানের বৃদ্ধ অসুস্থ মাকে ইকতির সেবা করতে কেন অনীহা দেখালেন এবং সীমানও কেন এক সময় মায়ের মৃত্যু কামনা করেছে? তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগে সীমানের মা কি একজন নারী নয়? অপরদিকে ফর্‌রুখ আহমদ নারীর সম্মানের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ প্রকাশ করেছেন। যেখানে নারীবাদী আন্দোলনের অন্যতম লক্ষ্যই হলো নারীর 'নৈতিক প্রত্যয়, নিজের মর্যাদা

রক্ষা করা' (Meyers, 1995: 223) সেখানে 'দৃষ্টিভঙ্গি, আচরণ এবং লক্ষ্য বস্তু' (Meyers, 1995: 223) কেবল পারে নারীর সম্মানকে রক্ষা করতে। এর সবগুলো সেলিনা হোসেনের উক্ত গল্পে অনুপস্থিত এবং ফর্‌রুখ আহমদের গল্পে বিদ্যমান। তাছাড়া 'ব্যক্তির স্বাধীনতা সার্বিক মঙ্গল থেকে অর্জিত হয় বলে ব্যক্তির স্বাধীনতা সমষ্টির কল্যাণের অধস্তন বলে স্বীকৃত রয়েছে' (খানম, ২০০৫: ১৫)। পক্ষান্তরে, ইকতি এখানে ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে যা করেছে তা সমাজের গতি পথে অন্ধকারকে ঘনীভূত করা ছাড়া অন্য কিছু করেনি, কেননা তা সামষ্টিক জনকল্যাণের বিপক্ষে কাজ করেছে। অন্য দিকে ফর্‌রুখ আহমদের সৃষ্টি রউফ সাহেবের ব্যক্তি স্বাধীনতার কারণে সমাজের সামষ্টিক জনকল্যাণকে যে বিঘ্নিত করতে পারে তা চিত্রিত করেছেন এবং তিনটি ভয়াবহতাও তুলে ধরেছেন। এক, ধর্মীয় বিধানানুসারে অবৈধ সন্তানের পাপ না থাকলেও পাপিষ্টের রক্ত বহনের কারণে সে সন্তানও যে একদিন সমাজকে অস্থিতিশীল করে তুলবে তা দেখিয়েছেন লফিতার কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে। দুই, প্রগতিশীলতার কারণে সমাজের শান্তিকামী মানুষের যে ক্ষতি হয় বা হতে পারে তাও তুলে ধরেছেন। তিন, ক্রমাগতভাবে নারীর উপর আক্রমণে মনুষত্বের উপর যে আঘাত তা প্রকাশ পেয়েছে সুফিয়া ও রাহেলার আত্মহত্যার মাধ্যমে। ফলে, একথা বলা যায়, ফর্‌রুখ আহমদ ব্যক্তি স্বাধীনতার নামে জনকল্যাণের বিঘ্নকে সমর্থন করেন নি।

নারীবাদীরা যেমনটি দাবি করে বলেন, পুরুষেরা যৌন ভোগ্য পণ্য হিসেবে ব্যবহার করে। ফর্‌রুখ আহমদ এ দৃষ্টিভঙ্গির আঘাত করেছেন কিন্তু সীমান, সাজন ও ইকতির প্রতিটি প্রদক্ষেপ কেবল শারীরিক এবং যৌন আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ও বাস্তবায়ন। এখানে মানবিকতা, প্রেম ও শ্রদ্ধার কোনো স্থান হয়নি।

এ ছাড়াও সেলিনা হোসেন-এর গল্পে ইকতি সীমানের মা তথা নিজের শ্বাশুড়ির সেবার জন্য একজন বাঁদি নিয়োগের কথা বললেন। প্রকৃত অর্থে একজন বাঁদি নারী, এ কথা বলে মূলত সে নারীসমাজকে অপমানিত করা হয়েছে। অন্যদিকে ফর্‌রুখ আহমদ-এর গল্পে নারীর মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা হয়েছে এবং নারী-পুরুষের সমান মর্যাদার কথা বলা হয়েছে। কেননা কুরআনে সুস্পষ্টভাবে পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য নির্ধারণ করে দিয়েছে এবং ঘোষণা করেছে,

> 'আমি মানুষকে তার পিতা-মাতার প্রতি সদাচারের নির্দেশ দিয়েছি" (সুরা আহকাফ, ৪৬: ১৫)।

নারী তথা মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে-এর দৃষ্টিভঙ্গি অত্যন্ত ইতিবাচক। ফলে নারীর মর্যাদা সম্পর্কে বেশ কিছু হাদিস এখানে প্রাসঙ্গিক। একজন মেয়ে সন্তানের শিক্ষার প্রতি গুরুত্ব আরোপ করে বলেন,

> 'যে ব্যক্তির কোনো কন্যা সন্তান থাকে এবং তাকে সে উত্তম বিদ্যা শিক্ষা ও উত্তম আচরণ শেখায়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়' (তাবারানি)।

অন্য এক হাদিসে মায়ের মর্যাদা সম্পর্কে বর্ণনা করতে গিয়ে রসুল সা. বলেন,

> কোনো সন্তানের কাছে পিতা যদি একবার সেবা পায় তার কাছে মা তিনবার সেবা পাবে (আল বুখারি ও মুসলিম) এবং আরেক হাদিসে এক মানবসন্তানকে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করার চেয়ে মায়ের পদতলে বসে সেবা করার প্রতি বেশি গুরুত্ব আরোপ করেছেন, কেননা মায়ের পদতলে সন্তানের জান্নাত (তাবারানি)।

নারীর স্বাধীনতা একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বর্তমান সমাজে। কেননা, 'শান্তির পূর্বশর্ত হল স্বাধীনতা' (সুলতানা, ১৯৯৪: ৩৬)। প্রকৃত অর্থে স্বাধীনতা কী? স্বাধীনতা হলো 'অন্যের অধিকার ও হক নষ্ট না করে, ক্ষুণ্ন না করে

নিজের অধিকার ও প্রাপ্তি পূর্ণরূপে পাবার সুনিশ্চিত গ্যারান্টি' (সুলতানা, ১৯৯৪: ৩৬)। এ সংজ্ঞানুসারে ফর্‌রুখ আহমদ-এর গল্পে উল্লেখিত সুফিয়া ও রাহেলা স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন এবং এর জন্য তিনি রউফ সাহেবকে দায়ী করেছেন। কিন্তু সেলিনা হোসেন-এর গল্পে সীমান স্ত্রীর অধিকার যেমন পরিপূর্ণ করতে পারেন নি, তেমনি ইকতি স্বাধীকার যেমন ক্ষুণ্ন করেছেন তেমনি বিশ্বাসঘাতকতাও করেছেন। তাই ইকতির হেন কাজটি কোনোভাবেই নারী স্বাধীনতার রূপ হতে পারে না। তাছাড়া ইকতি নিজের যৌবনের চাহিদা মিটাতে যেমন একজন পুরুষের উপর নির্ভরশীল হয়েছেন তেমনি অনাগত সন্তানের দায়িত্ব ও নিশ্চয়তার জন্য সীমানের উপরই নির্ভর করেছেন। তিনি যদি নারীর অর্থনৈতিক মুক্তি অর্জনের মাধ্যমে এবং জৈবিক চাহিদা বঞ্চিত হবার কারণে আনুষ্ঠানিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের মাধ্যমে সীমানকে ছেড়ে সাজনকে গ্রহণ করতেন তবে সেটি নারীর স্বাধীনতা ও অধিকারের পর্যায়ে পরতো। কিন্তু হেন কাজ কেবলই প্রতারণা ও শঠতার পরিচয়কে বহন করেছে।

হুমায়ূন আজাদ নারী আন্দোলনের মাত্রাকে বৃদ্ধি করার আহ্বান জানিয়ে বলেন, 'নারী জৈবিকভাবে এক পুরুষের সতী নয়। একাধিক পুরুষের সাথে কাম সংসর্গে তার আপত্তি নাই, তবে তন্ত্রের ভয়ে অধিকাংশ নারীই তা স্বীকার করে না' (আজাদ, ২০০৪: ৭৮)। সেলিনা হোসেন-এর গল্পে এ কথাগুলির প্রতিধ্বনিত হয়েছে। ফলে একে নারীবাদ না বলে কেউ কেউ নগ্নতাবাদ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন (নীলজোছনা, ২০১৪)। বিভ্রান্তির জন্য নগ্নতাবাদীরা নারী-পুরুষের অবাধ যৌন বা কাম স্বাধীনতাকে নারীবাদী আন্দোলন তথা নারীর স্বাধীনতা বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। প্রকৃত অর্থে 'নারীবাদ হচ্ছে নারীর আত্মসত্তাকে জাগ্রত করে নারীকে সমাজে সম্মানের আসনে অধিষ্ঠিত করা' (নীলজোছনা, ২০১৪)।

সমাজে নারী-পুরুষের যে পার্থক্য রয়েছে তা কেবলই শারীরিক। এ পার্থক্য ভুলে মানুষ পরিচয়ে মায়ের ভূমিকা সবচেয়ে বেশি। এ প্রসঙ্গে নারী-পুরুষের মর্যাদার উপর সমগুরুত্ব আরোপ করে আল্লাহ সুস্পষ্ট ঘোষণা দেন,

> 'নিশ্চয় মুসলিম নারী ও পুরুষ, মুমিন নারী ও পুরুষ, প্রার্থনাকারী ও প্রার্থনাকারিণী, সত্যবাদী ও সত্যবাদিনী, ধৈর্যধারী ও ধৈর্যধারিণী, বিনয়ী পুরুষ ও বিনয়ী স্ত্রী, সদকা প্রদানকারী ও সদকা প্রদানকারিণী, রোযাদার পুরুষ ও স্ত্রী, সচ্চরিত্র পুরুষ ও স্ত্রী, এবং আল্লাহকে স্মরণকারী পুরুষ ও স্ত্রী- এদের সকলের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও বিরাট পুরস্কার নির্ধারণ করে রেখছেন' (সুরা আল আহযাব, ৩৩: ৩৫)।

তাই একথা বলা যায়, 'একজন নারী তার নাড়ি ছিড়ে যে সন্তান প্রসব করে, সেই সন্তান পুরুষ আর নারীর পরিচয়ের বাইরে তখনই মানুষ হয়ে উঠবে যখন সেই মা নিজেকে মানুষ হিসেবে প্রমাণ করার যোগ্যতা রাখবেন' (ফিনিক্স, ২০১৫)। মানুষ হওয়ার প্রসঙ্গটি নির্ভর করছে সন্তানের পরিচয়ের উপর। যে সন্তানকে তার পিতা বা যে নারী-পুরুষ বহুগামীতার কারণে সন্তান জন্ম দেয় তা পশু জীবনের চেয়ে অধিক কিছু নয়। এছাড়া পুরুষ তার যৌন বাসনাকে চরিতার্থ করার জন্য কোনো নারীর উপর চাপ বা জোর প্রয়োগ করতেও পারেন না, কেননা তা পশুর চেয়ে নিকৃষ্ট আচরণ হিসেবে গণ্য (শুক্‌কাহ, ২০১১: ১৪২)।

উপসংহার

নারীবাদী আন্দোলনের বহুমাত্রিকতা একটি স্বাভাবিক বিষয়। কিন্তু নারীর অধিকার বিশ্বব্যপি প্রায় একই। নারীবাদের ভিন্নতার সুযোগ নিয়ে কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর স্ব-অঞ্চলের সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার অধিকার রাখে

না। পাশাপাশি নারীবাদ কেবল লিঙ্গ ভিত্তিক যে বৈষম্য রয়েছে তাকে প্রশ্নবিদ্ধ করে পরিবর্তনের কথা বলতে পারে। তবে কোনো সমাজ বা দেশের ইতিহাস বা ঐতিহ্যকে ভেঙ্গে নতুনভাবে তথা পশ্চিমা ধাঁচে বিনির্মাণ করতে পারে না। এছাড়াও নারীবাদ নগ্নতাবাদকে স্থান দেয়নি, যা সেলিনা হোসেন তার লেখনীতে ধারণ করেছেন। তবে সেলিনা হোসেনের মত লেখিকাদের দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোকপাত করাও সমস্যা এবং বিপদজনক। কেননা,

> জীবিত মানুষদের নিয়ে লেখা এমনিতেই অসুবিধাজনক। মানুষ তো রক্ত মাংসের,- তাই, নিন্দা-প্রসংশা-যাই করা হোক না কেন, সেটাকে পারসোনালি নেয়ার একটা ব্যাপার সব ক্ষেত্রে না হলেও, দিনকাল যা হয়েছে, তাতে এসেই যাচ্ছে।... কিন্তু একজনের শিল্প বিচারের ক্ষেত্রে ব্যক্তিজীবন নিয়ে আনাটাকে আমার কাছে অযথা হস্তক্ষেপ বলেই প্রতীত হয়। কেননা, লেখাকে যদি রিপোর্টিং মনে করেন, তবে ঠিক আছে, তবে সেটা তো আর তা নয়। সব সময়ই তা ইনটুইটিভ। আর এ কারণেই তা অতিক্রম করে যায় ব্যক্তিজীবনের সীমা (মতিন, ২০১৫: ৬১)।

প্রকৃত অর্থে তথাকথিত নারীবাদীরা পুঁজিতান্ত্রিক নব্য সাম্রাজ্যবাদের প্রতিনিধিত্ব করেন (Hanson & Bond, 2010: 21)। ফলে, 'এমনও অনেক নারীবাদী নারী-পুরুষ আছেন যাঁরা কেবল তাত্ত্বিক নারীবাদিত্বের লড়াই করেন কিন্তু ব্যবহারিক জীবনাচরণে নারীকে দেখেন পুরুষতান্ত্রিক দৃষ্টিতে' (মুসলিমা, ২০১৪)।

পরিশেষে একথা অবশ্যই স্বীকার করতে হবে 'পুরুষতন্ত্র অবশ্যই বর্জনীয়, তা বলে পুরুষ মাত্রই পুরুষতান্ত্রিক নন, অন্যদিকে নারী জীবনের বঞ্চনা ও নির্যাতনের মধ্যে কাল কাটিয়েও সব নারীই নারীবাদী নন' (মুসলিমা, ২০১৪)। তাই নারী-পুরুষের মৌলিক বৈষম্য দূর করে সমাজের স্থিতিশীলতা বজায় রাখতে হবে এবং নৈতিক মূল্যবোধের মাধ্যমে মানুষের স্বাভাবিক জীবন প্রণালীকে টিকিয়ে রাখাই হবে নারীবাদের উদ্দেশ্য। নারী কার আপন স্বকীয়তায় চির ভাস্বর হবে এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে নারীবাদ বিমূর্ত হোক।

গ্রন্থপঞ্জি

আজাদ, হুমায়ূন, *নারী*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৪।

আহমদ, ফর্‌রুখ, 'মৃত-বসুধা, আবদুল মান্নান সৈয়দ সম্পাদিত, *ফর্‌রুখ আহমদ সমগ্র প্রথম খণ্ড*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬।

আহমেদ, মিলন, 'আমি কেন নারীবাদী', মে ২৩, ২০১৩, Retrieved from http://www.samakal.net/2014/09/23/87969.

এঙ্গেলস, ফ্রেডরিখ, 'পরিবার', বদরুদ্দীর উমর অনূদিত ও সম্পাদিত, *নারী প্রশ্ন প্রসঙ্গ*, শ্রাবণ, ঢাকা, ২০০৩: ১৩-২৯।

খানম, রাশিদা আখতার, *নারীবাদ ও দার্শনিক প্রেক্ষাপট*, সাহিত্যিকা, ঢাকা, ২০০৫।

গুপ্ত, শ্যামলী, 'নারীদের জীবনে বিশ্বায়নের প্রভাব', শ্যামলী গুপ্ত, মালিনী ভট্টাচার্য, ঈশিতা মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, *নারী ও বিশ্বায়ন*, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ২০০৭: ১০-২২।

চক্রবর্তী, রামী, 'সেলিনার গল্পবিশ্বে নারীর আকাঙ্ক্ষার ক্ষমতায়ন', চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত, *গল্পকথা সেলিনা হোসেন সংখ্যা, বর্ষ ৫ সংখ্যা ৬*, ফেব্রুয়ারি ২০১৫: ৪০৯-৪১৭।

জোয়ারদার, বাবুল, 'উৎস থেকে নিরন্তর: মানবতার জয়গান', চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত, *গল্পকথা সেলিনা হোসেন সংখ্যা, বর্ষ ৫ সংখ্যা ৬*, ফেব্রুয়ারি ২০১৫:৩২৭-৩৩৩।

- - -, 'নারীবাদী তত্ত্ব ও মতিজানের মেয়েরা', বেগম আকতার কামাল সম্পাদিত, *বিশ শতকের প্রতীচ্য সাহিত্য ও সমালোচনাতত্ত্ব*, অবসর, ঢাকা, ২০১৪: ২৩১-২৪২।

নীলজোছনা, 'নারীবাদী বনাম 'নারী'বাদী', ২০১৪, Retrieved from http://womenexpress.net/neeljosna85/women-social-psychological-underprivileged-women/

ফিনিক্স, 'নারীবাদী-বাদী=(শুধুই) নারী', ২০১৫, Retrieved from http://shorob.com/19806

মতিন, জুলফিকার, 'ফর্‌রুখ আহমদ: একটি মূল্যায়ন', *কবিতার দেশ*, বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৯৬: ৪৫-৪৯।

- - - , 'সেলিনা হোসেন ও তাঁর অবস্থান কিংবা লেখিকাদের মহাত্ম বর্ণনা', চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত, *গল্পকথা সেলিনা হোসেন সংখ্যা*, *বর্ষ ৫ সংখ্যা* ৬, ফেব্রুয়ারি ২০১৫: ৫৭-৫৮।

মুসলিমা, উম্মে, 'নারীবাদী নয়, সমতাবাদী', *দৈনিক প্রথম আলো*, মতিউর রহমান সম্পাদিত, অক্টোবর ২২, ২০১৪।

রহমান, অধ্যাপক মুহম্মদ মতিউর, *ইসলামে নারীর মর্যাদা ও অধিকার*, তামিম প্রকাশনী, ঢাকা, ২০১১।

রহমান, গাউসুর, *ফর্‌রুখ আহমদ: মানবতার কবি*, দীপ্তি প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০৬।

শুক্কাহ, আবদুল হালীম আবু, *রসুলের সা. যুগে নারী স্বাধীনতা ১ম খণ্ড*, বিআইআইটি, ঢাকা, ২০১১।

সিদ্দিকী, জিল্লুর রহমান, 'অভিভাষণ', মুহাম্মদ মতিউর রহমান সম্পাদিত, *ফর্‌রুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রথম খণ্ড*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইট লি., ঢাকা, ২০১৫: ১১২-১১৭।

সুলতানা, কবিতা, *ধন্য আমি নারী*, মদীনা পাবলিকেশান্স, ঢাকা, ১৯৯৪।

সায়ীদ, আবদুল্লাহ আবু, 'ফররুখ আহমদ', মুহাম্মদ মতিউর রহমান সম্পাদিত, *ফর্‌রুখ আহমদের স্বাতন্ত্র্য ও বৈশিষ্ট্য প্রথম খণ্ড*, বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইট লি., ঢাকা, ২০১৫: ৪০১-৪০৮।

সৈয়দ, আব্দুল মান্নান, 'ফররুখ আহমদের গল্প', *ফর্‌রুখ একাডেমী পত্রিকা*, মুহম্মদ মতিউর রহমান সম্পাদিত, ২৭তম সংকলন, জুন-২০১৫, ফর্‌রুখ গবেষণা ফাউন্ডেশন, ঢাকা, ২০১৫: ২১-২৬।

হক, হাসান আজিজুল, 'সেলিনার বাংলাদেশ', চন্দন আনোয়ার সম্পাদিত, *গল্পকথা সেলিনা হোসেন সংখ্যা*, ফেব্রুয়ারি ২০১৫: ৪৬-৪৭।

হেদায়েতুল্লাহ, মোহাম্মদ, 'বঙ্গীয় মুসলিম সাহিত্য', মোহাম্মদী, জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৬।

হোসেন, কবি আবুল, *কিছু স্মৃতিঃ ওয়ালীউল্লাহ*, সময় প্রকাশনী, ঢাকা, ১৯৮০।

হোসেন, সেলিনা, সাক্ষাৎকার, অগ্রবীজ, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, যুক্তরাষ্ট্র, ২০০৯: ১৩-৪৫।

-------, 'বৈশাখী গান', *উৎস থেকে নিরন্তর*, ভূমিকা, ঢাকা, ২০০৯ (১৯৬৯)।

Hannan, Shah Abdul, *Islam and Gender: The Bangladesh Perspective*, BIIT, Dhaka, 2016.

Hanson, Shaykh Hamza Yusuf & Bond, Julian, *Rethinking Muslim Women & The Veil*, IIIT Books, UK, 2010.

Hasan, Md. Mahmudul, "Islam's encounter with women's rights and feminism: The need for greater engagement of Muslim women", *BIIT Journal*, Dhaka, 2013: 81-94.

Hooks, B., 'Feminism: A Movement to End Sexist Oposition', in A Phillips, ed., *Feminism and Equality*, Oxford: Basil Blackwekk, 1987: 54-65.

Meyers, D. T., 'Self-Respect and Autonomy', in R. S. Dillon, ed., *Dignity, Character and Self-Resect*, Routledge, London, 1995: 220-234.

Nayar, Pramod K., *Contemporary Literary and Cultural Theory From Structuralism to Ecocentrism*, Pearson, Delhi, 2011.

Sanford, L. T. & Donowan, M.E., *Women and self-estem*, Penguin Books, New York, 1985: XIII, XVI.